

চতুর্থ অধ্যায়

পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক গঠন

Internal and External Structure of the Earth

জন্মের সময় পৃথিবী ছিল এক উত্তপ্ত গ্যাসপিণ্ড। এই গ্যাসপিণ্ড ক্রমে ক্রমে শীতল হয়ে ঘনীভূত হয়। এ সময় এর উপর যে আস্তরণ পড়ে তা হলো ভূত্বক। ভূগর্ভের রয়েছে তিনটি স্তর। অশ্মমন্ডল, গুরুমন্ডল ও কেন্দ্রমন্ডল। ভূত্বক যেসব উপাদান দিয়ে তৈরি তার সাধারণ নাম শিলা। পৃথিবীতে কার্যরত বিভিন্ন ভূমিরূপ প্রক্রিয়া শিলা ও খনিজের ধরন দ্বারা প্রভাবিত হয়। ভূপৃষ্ঠ সর্বদা পরিবর্তনশীল। এ পরিবর্তন দুরকম। ধীর পরিবর্তন ও আকস্মিক পরিবর্তন। এ অধ্যায়ে আমরা পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক গঠন, বিভিন্ন রকম শিলা, ভূপৃষ্ঠের ধীর ও আকস্মিক পরিবর্তন এবং বিভিন্ন ভূমিরূপ নিয়ে আলোচনা করব।



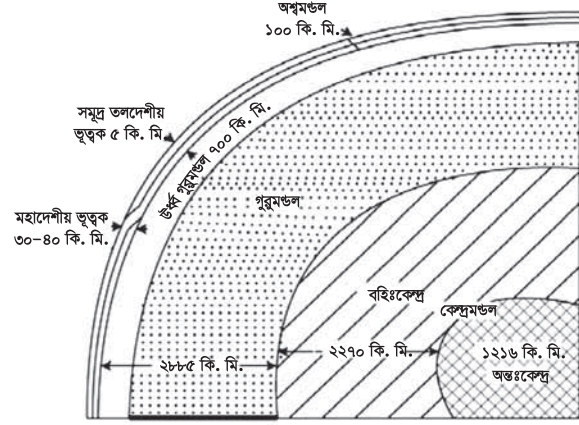
এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা—

- পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ গঠন বর্ণনা করতে পারব।
- পৃথিবীর বাহ্যিক গঠন বর্ণনা করতে পারব।
- ভূপৃষ্ঠের পরিবর্তন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারব।
- ভূপৃষ্ঠের আকস্মিক পরিবর্তনের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- ভূমিকম্প, সুনামি ও গ্ল্যাচিপাতের কারণ এবং ফলাফল বিশ্লেষণ করতে পারব।
- ভূপৃষ্ঠের ধীর পরিবর্তনের কারণ ও ফলাফল ব্যাখ্যা করতে পারব।
- নদীর গতিপথ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- নদী দ্বারা সৃষ্ট ভূমিরূপ বর্ণনা করতে পারব।
- পৃথিবীর প্রধান ভূমিরূপের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারব।
- তথ্য-উপাত্ত পর্যালোচনার ভিত্তিতে অতীতে সংঘটিত কোনো একটি সুনামির প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব।

পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ গঠন (Internal Structure of the Earth)

সৃষ্টির সময় পৃথিবী ছিল একটি উত্তপ্ত গ্যাসপিণ্ড। উত্তপ্ত অবস্থা থেকে এটি শীতল ও ঘনীভূত হয়। এই সময় পৃথিবীর বাইরের ভারী উপাদানগুলো এর কেন্দ্রের দিকে জমা হয়। আর হালকা উপাদানগুলো ভরের তারতম্য অনুসারে নিচের থেকে উপরে স্তরে স্তরে জমা হয়। পৃথিবীর এই বিভিন্ন স্তরকে মন্ডল বলে। উপরের স্তরটিকে অশ্বামন্ডল বলে। অশ্বামন্ডলের উপরের অংশ ভূত্বক নামে পরিচিত।

ভূত্বক (Earth's Crust) : ভূপৃষ্ঠে শিলার যে কঠিন বহিরাবরণ দেখা যায় তাই ভূত্বক (চিত্র ৪.১)। ভূঅভ্যন্তরের অন্যান্য স্তরের তুলনায় ভূত্বকের পুরুত্ব সবচেয়ে কম; গড়ে ২০ কিলোমিটার। ভূত্বক মহাদেশের তলদেশে গড়ে ৩৫ কিলোমিটার এবং সমুদ্র তলদেশে তা গড়ে মাত্র ৫ কিলোমিটার পুরু। সাধারণভাবে মহাদেশীয় ভূত্বকের এ স্তরকে সিয়াল (Sial) স্তর বলে, যা সিলিকন (Si) ও অ্যালুমিনিয়াম (Al) দ্বারা গঠিত, যা সিয়াল স্তরের তুলনায় ভারী এবং এর প্রধান খনিজ উপাদানের সিলিকন (Si) ও ম্যাগনেসিয়াম (Mg) যা সাধারণভাবে সিমা (Sima) নামে পরিচিত। অনুমান করা হয় যে, এ ব্যাস্ট স্তরই



চিত্র ৪.১ : পৃথিবীর গঠন কাঠামোর আড়াআড়ি চিত্র
উৎস : Trabuck and Lutgens (1994)

সারা পৃথিবী জুড়ে বহিরাবরণ ও গভীর সমুদ্র তলদেশে বিদ্যমান। ভূত্বকের উপরের ভাগেই বাহ্যিক অবয়বগুলো দেখা যায়। যেমন— পর্বত, মালভূমি, সমভূমি ইত্যাদি। ভূত্বকের নিচের দিকে প্রতি কিলোমিটারে 30° সেলসিয়াস তাপমাত্রা বাড়ে।

গুরুমন্ডল (Barysphere) : ভূত্বকের নিচে প্রায় ২,৮৮৫ কিলোমিটার পর্যন্ত গুরুমন্ডলকে গুরুমন্ডল বলে। গুরুমন্ডল মূলত ব্যাস্ট (Basalt) শিলা দ্বারা গঠিত। এ অংশে রয়েছে সিলিকা, ম্যাগনেসিয়াম, লোহা, কার্বন ও অন্যান্য খনিজ পদার্থ। গুরুমন্ডল দুই ভাগে বিভক্ত। (ক) উর্ধ্ব গুরুমন্ডল যা ৭০০ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত। এই মন্ডল প্রধানত লোহা ও ম্যাগনেসিয়াম সমৃদ্ধ সিলিকেট খনিজ দ্বারা গঠিত। (খ) নিম্ন গুরুমন্ডল প্রধানত আয়রন অক্সাইড, ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড এবং সিলিকন ডাইঅক্সাইড সমৃদ্ধ খনিজ দ্বারা গঠিত।

কেন্দ্রমন্ডল (Centrosphere) : গুরুমন্ডলের ঠিক পরে রয়েছে কেন্দ্রমন্ডল। গুরুমন্ডলের নিচ থেকে পৃথিবীর কেন্দ্র পর্যন্ত এই মন্ডল বিস্তৃত। এ স্তর প্রায় ৩,৪৮৬ কিলোমিটার পুরু। ভূকম্পন তরঙ্গের সাহায্যে জানা গেছে যে, কেন্দ্রমন্ডলের একটি তরল বহিরাবরণ আছে, যা প্রায় ২,২৭০ কিলোমিটার পুরু এবং একটি কঠিন অন্তঃভাগ আছে, যা ১,২১৬ কিলোমিটার পুরু। বিজ্ঞানীগণ বিশ্বাস করেন যে, কেন্দ্রমন্ডলের উপাদানগুলোর মধ্যে লোহা, নিকেল, পারদ ও সিসা রয়েছে। তবে প্রধান উপাদান হলো নিকেল ও লোহা।

পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ গঠন উপাদান : শিলা ও খনিজ (Rocks and Minerals)

ভূত্বক শিলা দ্বারা গঠিত। শিলা গঠিত বিভিন্ন খনিজের সথিমিশ্রণে। জানা যাক, খনিজ বলতে কী বোঝায়? শিলা ও খনিজের পার্থক্য কী? কতকগুলো মৌলিক উপাদান প্রাকৃতিক উপায়ে মিলিত হয়ে যে যৌগ গঠন করে তাই খনিজ। খনিজ হলো একটি প্রাকৃতিক অজৈব পদার্থ যার সুনির্দিষ্ট রাসায়নিক গঠন এবং ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম রয়েছে। আর শিলা হলো এক বা একাধিক খনিজের মিশ্রণ। খনিজ দুই বা ততোধিক মৌলের সমন্বয়ে গঠিত হলেও কিছু কিছু খনিজ একটি মাত্র মৌল দ্বারাও গঠিত হতে পারে। যেমন— হীরা, সোনা, তামা, রূপা, পারদ ও গন্ধক।

শিলা গঠনকারী প্রতিটি খনিজের আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য বজায় থাকে। যদিও বেশিরভাগ শিলাই একাধিক খনিজ দ্বারা গঠিত হয়। সে ক্ষেত্রে খনিজ এবং শিলা একই পদার্থ। উদাহরণ হলো, পাললিক শিলা চুনাপাথর। এটি ক্যালসাইট নামের একটি খনিজ। শিলা হিসেবে এটি চুনাপাথর নামে পরিচিত।

শিলা ও খনিজের মধ্যে পার্থক্য (Difference between rocks and minerals) : খনিজ এক বা একাধিক মৌলিক পদার্থের সমন্বয়ে গঠিত আর শিলা এক বা একাধিক খনিজ পদার্থের সমন্বয়ে গঠিত। খনিজ সমসত্ত্ব অজৈব পদার্থ, শিলা অসমসত্ত্ব পদার্থ। খনিজ কঠিন ও স্ফটিকাকার হয়, কিছু কিছু শিলা কঠিন হলেও স্ফটিকাকার হয় না। খনিজের নির্দিষ্ট রাসায়নিক সংকেত আছে, শিলার কোনো রাসায়নিক সংকেত নেই। খনিজের ধর্ম এর গঠনকারী মৌলের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। অপরদিকে শিলার ধর্ম এর গঠনকারী খনিজ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

কাজ : নিম্নে ছকের মধ্যে শিলা ও খনিজের বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।	
শিলা	খনিজ
•	•
•	•
•	•
•	•

শিলা ও এর শ্রেণিবিভাগ (Classification of Rocks)

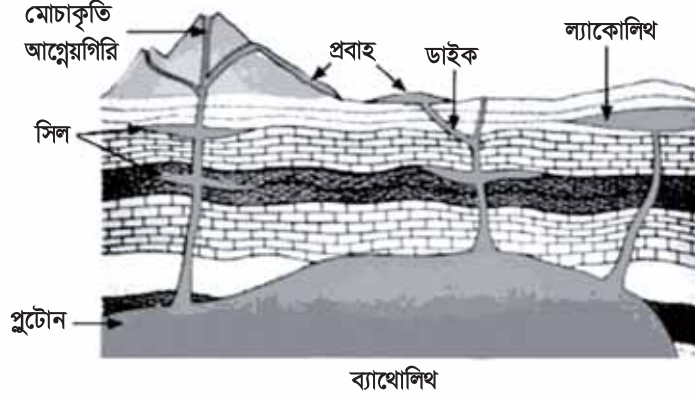
ভূত্বক যেসব উপাদান দ্বারা গঠিত তাদের সাধারণ নাম শিলা। ভূতত্ত্ববিদগণের মতে দুই বা ততোধিক খনিজ দ্রব্যের সন্নিবেশে এসব শিলার সৃষ্টি হয়। ভূত্বক গঠনকারী সকল কঠিন ও কোমল পদার্থই শিলা। উদাহরণস্বরূপ নুড়ি, কাঁকর, গ্রানাইট, কাদা, বালি প্রভৃতি। গঠনপ্রণালি অনুসারে শিলাকে তিনটি প্রধান শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয় : (১) আগ্নেয় শিলা, (২) পাললিক শিলা ও (৩) রূপান্তরিত শিলা।

১। আগ্নেয় শিলা (Igneous Rocks) : জন্মের প্রথমে পৃথিবী একটি উত্তপ্ত গ্যাসপিণ্ড ছিল। এই গ্যাসপিণ্ড ক্রমাগত তাপ বিকিরণ করে তরল হয়। পরে আরও তাপ বিকিরণ করে এর উপরিভাগ শীতল ও কঠিন আকার ধারণ করে। এভাবে গলিত অবস্থা থেকে ঘনীভূত বা কঠিন হয়ে যে শিলা গঠিত হয় তাকে আগ্নেয় শিলা বলে। আগ্নেয় শিলা পৃথিবীর প্রথম পর্যায়ে সৃষ্টি হয় তাই এই শিলাকে প্রাথমিক শিলাও বলে। এ শিলায় কোনো স্তর নেই। তাই আগ্নেয় শিলার অপর নাম অন্তরীভূত শিলা। এই শিলায় জীবশ্মা নেই। এই শিলার বৈশিষ্ট্য হলো— (ক) স্ফটিকাকার, (খ) অন্তরীভূত, (গ) কঠিন ও কম ভজুর, (ঘ) জীবশ্মা দেখা যায় না এবং (ঙ) অপেক্ষাকৃত ভারী।

আগ্নেয়গিরি বা ভূমিকম্পের ফলে অনেক সময় ভূত্বকের দুর্বল অংশে ফাটলের সৃষ্টি হয়। তখন পৃথিবীর অভ্যন্তর থেকে উত্তপ্ত গলিত লাভা নির্গত হয়ে আগ্নেয় শিলার সৃষ্টি করে। এভাবে ব্যাসল্ট ও গ্রানাইট শিলার সৃষ্টি হয়। আগ্নেয় শিলাকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা— (ক) বহিঃজ আগ্নেয় শিলা ও (খ) অন্তঃজ আগ্নেয় শিলা

(ক) বহিঃজ আগ্নেয় শিলা (Extrusive Igneous Rocks) : ভূগর্ভের উত্তপ্ত তরল পদার্থ ম্যাগমা আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত বা অন্য কোনো কারণে বেরিয়ে এসে শীতল হয়ে জমাট বেঁধে বহিঃজ আগ্নেয় শিলার সৃষ্টি হয়, এদের দানা খুব সূক্ষ্ম, রং গাঢ়। এই শিলার উদাহরণ হলো ব্যাসল্ট, রাইওলাইট, অ্যান্ডিসাইট ইত্যাদি।

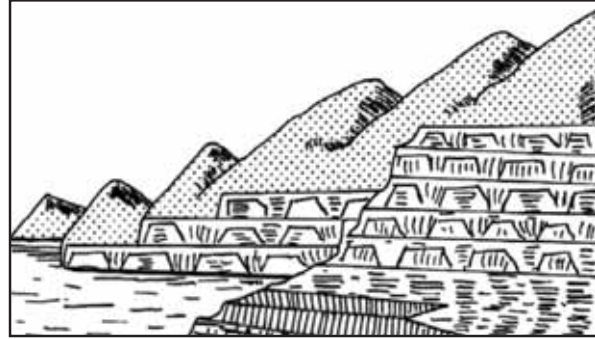
(খ) **অন্তঃজ আগ্নেয় শিলা (Intrusive Igneous Rocks)** : উত্তপ্ত ম্যাগমা ভূপৃষ্ঠের বাইরে না এসে ভূগর্ভে জমাট বাঁধলে তৈরি হয় অন্তঃজ আগ্নেয় শিলা। এর দানাগুলো স্থূল ও হালকা রঙের হয়। গ্রানাইট, গ্যাব্রো, ডলোরাইট, ল্যাকোলিথ, ব্যাথোলিথ, ডাইক ও সিল এ শিলার অন্যতম উদাহরণ (চিত্র ৪.২)।



চিত্র ৪.২ : আগ্নেয় শিলা

২। **পাললিক শিলা (Sedimentary Rocks)** : পলি সঞ্চিত হয়ে যে শিলা গঠিত হয়েছে তাকে পাললিক শিলা বলে। বৃষ্টি, বায়ু, তুষার, তাপ, সমুদ্রের ঢেউ প্রভৃতি শক্তির প্রভাবে আগ্নেয় শিলা ক্ষয়প্রাপ্ত ও বিচূর্ণীভূত হয়ে রূপান্তরিত হয় এবং কাঁকর, কাদা, বালি ও ধুলায় পরিণত হয়। ক্ষয়িত শিলাকণা জলস্রোত, বায়ু এবং হিমবাহ দ্বারা পরিবাহিত হয়ে পলল বা তলানিরূপে কোনো নিম্নভূমি, হ্রদ এবং সাগরগর্ভে সঞ্চিত হতে থাকে। পরবর্তীতে ঐসব পদার্থ ভূগর্ভের উত্তাপে ও উপরের শিলাস্তরের চাপে জমাট বেঁধে কঠিন শিলায় পরিণত হয়। পাললিক শিলা ভূপৃষ্ঠের মোট আয়তনের শতকরা ৫ ভাগ দখল করে আছে। তবে মহাদেশীয় ভূত্বকের আবরণের ৭৫ ভাগই পাললিক শিলা। পলল বা তলানি থেকে গঠিত হয় বলে এরূপ শিলাকে পাললিক শিলা বলে (চিত্র ৪.৩)।

স্তরে স্তরে সঞ্চিত হয় বলে একে স্তরীভূত শিলাও বলে। পাললিক শিলা যৌগিক, জৈবিক বা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় গঠিত হতে পারে। বেলেপাথর, কয়লা, শেল, চুনাপাথর, কাদাপাথর, কেওলিন পাললিক শিলার উদাহরণ। জীবদেহ থেকে উৎপন্ন হয় বলে কয়লা ও খনিজ তেলকে জৈব শিলাও বলে। অনেক পাললিক শিলার মধ্যে নানাপ্রকার উদ্ভিদ ও জীবজন্তুর দেহাবশেষ বা জীবাশ্ম দেখা যায়।



চিত্র ৪.৩ : পাললিক শিলা

পাললিক শিলার বৈশিষ্ট্য : পাললিক শিলা স্তরীভূত, নরম ও হালকা, সহজেই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এর মধ্যে জীবাশ্ম দেখা যায়। এই শিলায় ছিদ্র দেখা যায়।

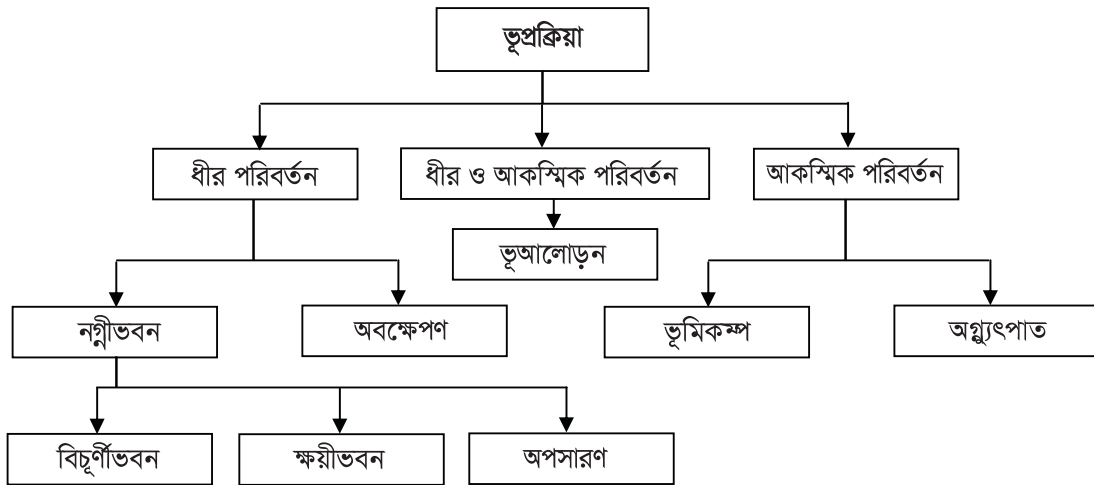
৩। **রূপান্তরিত শিলা (Metamorphic Rocks)** : আগ্নেয় ও পাললিক শিলা যখন প্রচণ্ড চাপ, উত্তাপ এবং রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে রূপ পরিবর্তন করে নতুন রূপ ধারণ করে তখন তাকে রূপান্তরিত শিলা বলে। ভূআন্দোলন, অগ্ন্যুৎপাত ও ভূমিকম্প, রাসায়নিক ক্রিয়া কিংবা ভূগর্ভস্থ তাপ আগ্নেয় ও পাললিক শিলাকে রূপান্তরিত করে। চুনাপাথর রূপান্তরিত হয়ে মার্বেল, বেলেপাথর রূপান্তরিত হয়ে কোয়ার্টজাইট, কাদা ও শেল রূপান্তরিত হয়ে স্লেট, গ্রানাইট রূপান্তরিত হয়ে নিস এবং কয়লা রূপান্তরিত হয়ে গ্রাফাইটে পরিণত হয়।

রূপান্তরিত শিলার বৈশিষ্ট্য : এই শিলা স্ফটিকযুক্ত, খুব কঠিন হয়। এতে জীবাশ্ম দেখা যায় না। কোনো কোনো রূপান্তরিত শিলায় ঢেউ খেলানো স্তর দেখা যায়।

কাজ : দলগতভাবে শিলার শ্রেণিবিভাগের ছকটি পূরণ কর।			
গঠনপ্রণালি অনুসারে শিলার শ্রেণিবিভাগ	প্রকারভেদ	বৈশিষ্ট্য	উদাহরণ
আগ্নেয় শিলা			
পাললিক শিলা			
রূপান্তরিত শিলা			

ভূপৃষ্ঠের পরিবর্তন প্রক্রিয়া (Changing process of the earth surface)

ভূপৃষ্ঠ সর্বদা পরিবর্তনশীল। নানাপ্রকার ভূপ্রক্রিয়া ভূপৃষ্ঠের পরিবর্তন সাধন করে। যে সমস্ত কার্যাবলির কারণে প্রাকৃতিকভাবে ভূমিরূপের পরিবর্তন সাধিত হয় তা ভূপ্রক্রিয়া। যেমন- নদী অবক্ষেপণের মাধ্যমে প্লাবন ভূমি গড়ে তুলছে। এখানে নদী অবক্ষেপণ একটি প্রক্রিয়া। ভূপ্রক্রিয়া তার কার্য সাধনের জন্য নানাপ্রকার প্রাকৃতিক শক্তির সাহায্য নেয়। যেমন- মাধ্যাকর্ষণ, ভূতাপীয় শক্তি এবং সৌরশক্তি। এ সমস্ত শক্তির সাহায্যে ভূপ্রক্রিয়া ভূপৃষ্ঠের কোথাও ধীরে ধীরে পরিবর্তন আনে, আবার কখনো কখনো খুব দ্রুত পরিবর্তন সাধন করে। সাধারণভাবে বহিঃশক্তির (যেমন- সৌরশক্তি) সঙ্গে জড়িত ভূপ্রক্রিয়া ভূপৃষ্ঠে ধীর পরিবর্তন আনে। সুদীর্ঘ সময় ধরে ভূপৃষ্ঠে এই পরিবর্তন চলে বিধায় একে ধীর পরিবর্তন বলে। ধীর পরিবর্তন সাধারণত দুটি প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হয়। যেমন- নগ্নীভবন ও অবক্ষেপণ। অপরদিকে অন্তঃশক্তির (যেমন- ভূমিকম্প) সঙ্গে জড়িত ভূপ্রক্রিয়ায় ভূপৃষ্ঠে দ্রুত পরিবর্তন সাধিত হয়। নিচে ভূত্বকের পরিবর্তন সাধনকারী ভূপ্রক্রিয়াসমূহের একটি ছক দেওয়া হলো।



ধীর পরিবর্তন : ধীর পরিবর্তন হলো আকস্মিক পরিবর্তনের একেবারেই বিপরীত অবস্থা। অনেকগুলো প্রাকৃতিক শক্তি যেমন- সূর্যতাপ, বায়ুপ্রবাহ, বৃষ্টিপাত, নদী, হিমবাহ প্রভৃতি দ্বারা যে পরিবর্তন ধীরে ধীরে সংঘটিত হয় তাকে ধীর পরিবর্তন বলে। এই ধীর পরিবর্তন বিশাল এলাকা জুড়ে হয়ে থাকে।

আকস্মিক পরিবর্তন : পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগ এখনও উত্তপ্ত ও গলিত অবস্থায় রয়েছে। এসব উত্তপ্ত বস্তুর মধ্যে তাপ ও চাপের পার্থক্য হলে ভূত্বকে যে আলোড়ন ঘটে তাকে ভূআলোড়ন বলে। এ ভূআলোড়নের ফলেই ভূপৃষ্ঠের বেশিরভাগ পরিবর্তন হয়ে থাকে। বিভিন্ন ভূমিরূপ গঠনকারী শক্তির প্রভাবে ভূগর্ভে সর্বদা নানারূপ পরিবর্তন হচ্ছে। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, ভূকম্পন, পৃথিবীর অভ্যন্তরের সংকোচন, ভূগর্ভের তাপ ও অন্যান্য প্রচণ্ড শক্তির ফলে ভূপৃষ্ঠে হঠাৎ যে পরিবর্তন সাধিত হয়, তাকে আকস্মিক পরিবর্তন বলে। এরূপ পরিবর্তন খুব বেশি স্থান জুড়ে হয় না। আকস্মিক পরিবর্তন সংঘটিত হয় প্রধানত ভূমিকম্প, সুনামি ও আগ্নেয়গিরি দ্বারা।

ভূমিকম্প (Earthquake)

পৃথিবীর কঠিন ভূত্বকের কোনো কোনো অংশ প্রাকৃতিক কোনো কারণে কখনো কখনো অল্প সময়ের জন্য হঠাৎ কেঁপে ওঠে। ভূত্বকের এরূপ আকস্মিক কম্পনকে ভূমিকম্প বলে। ভূকম্পন সাধারণত কয়েক সেকেন্ড স্থায়ী হয় আবার কখনো কিছু সময় পর পর অনুভূত হয়। এ কম্পন কখনো অত্যন্ত মৃদু আবার কখনো অত্যন্ত প্রচণ্ড হয়।

ভূমিকম্পের প্রধান কারণ (Main causes of earthquakes)

- পৃথিবীর উপরিভাগ কতকগুলো ফলক/প্লেট দ্বারা গঠিত। এই প্লেটসমূহের সঞ্চালন প্রধানত ভূমিকম্প ঘটিয়ে থাকে।
- অগ্ন্যুৎপাতের ফলে প্লেটসমূহের উপর ভূকম্পন সৃষ্টি হয়।

অপ্রধান কারণ

- ১। শিলাচ্যুতি বা শিলাতে ভাঁজের সৃষ্টি : কোনো কারণে ভূপৃষ্ঠের অভ্যন্তরে বড় ধরনের শিলাচ্যুতি ঘটলে বা শিলাতে ভাঁজের সৃষ্টি হলে ভূমিকম্প হয়। ১৯৩৫ সালে বিহারে এবং ১৯৫০ সালে আসামে এ কারণেই ভূমিকম্প হয়।
- ২। তাপ বিকিরণ : ভূত্বক তাপ বিকিরণ করে সংকুচিত হলে ফাটল ও ভাঁজের সৃষ্টি হয়ে ভূমিকম্প হয়।
- ৩। ভূগর্ভস্থ বাষ্প : পৃথিবীর অভ্যন্তরে অত্যধিক তাপের কারণে বাষ্পের সৃষ্টি হয়। এই বাষ্প ভূত্বকের নিম্নভাগে ধাক্কা দেওয়ার ফলে প্রচণ্ড ভূকম্পন অনুভূত হয়।
- ৪। ভূগর্ভস্থ চাপের বৃদ্ধি বা হ্রাস : অনেক সময় ভূগর্ভে হঠাৎ চাপের হ্রাস বা বৃদ্ধি হলে তার প্রভাবে ভূমিকম্প হয়।
- ৫। হিমবাহের প্রভাব : হঠাৎ করে হিমবাহ পর্বতগাত্র থেকে নিচে পতিত হলে ভূপৃষ্ঠ কেঁপে ওঠে এবং ভূমিকম্প হয়।

ভূমিকম্পের ফলাফল (Effects of earthquakes) : ভূমিকম্পের ফলে ভূপৃষ্ঠের অনেক ধরনের পরিবর্তন ঘটে এবং বহু ধ্বংসলীলা সাধিত হয়। ঘরবাড়ি, ধনসম্পদ ও যাতায়াত ব্যবস্থা বিনষ্ট হয়। এতে জীবনেরও ব্যাপক ক্ষতি হয়ে থাকে। নিচে ভূমিকম্পের ফলাফল আলোচনা করা হলো :

- (১) ভূমিকম্পের ফলে ভূত্বকের মধ্যে অসংখ্য ভাঁজ, ফাটল বা ধসের সৃষ্টি হয়। নদীর গতিপথ পাল্টে যায়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ১৭৮৭ সালে আসামে যে ব্যাপক ভূমিকম্প হয় তাতে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদের তলদেশ কিছুটা উঁচু হয়ে যায়। ফলে নদটি তার গতিপথ পাল্টে বর্তমানে যমুনা নদী দিয়ে প্রবাহিত হতে শুরু করে।
- (২) ভূমিকম্পের ফলে অনেক সময় সমুদ্রতল উপরে উঠিত হয়, পাহাড়-পর্বত বা দ্বীপের সৃষ্টি করে। আবার কোথাও স্থলভাগের অনেক স্থান সমুদ্রতলে ডুবে যায়। ১৮৯৯ সালে ভারতের কচ্ছ উপসাগরের উপকূলে প্রায় ৫,০০০ বর্গকিলোমিটার স্থান সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হয়।
- (৩) ভূমিকম্পের ফলে অনেক সময় নদীর গতি পরিবর্তিত হয় বা কখনো কখনো বন্ধ হয়ে যায়। কখনো কখনো নদী শুকিয়ে যায়। আবার সময় সময় উচ্চভূমি অবনমিত হয়ে জলাশয়ের সৃষ্টি হয়। ১৯৫০ সালে আসামের ভূমিকম্পে দিবং নদীর গতি পরিবর্তিত হয়।
- (৪) ভূমিকম্পের ফলে অনেক সময় পর্বতগাত্র থেকে হিমানীসম্প্রপাত হয় এবং পর্বতের উপর শিলাপাত হয়।
- (৫) ভূমিকম্পের ফলে হঠাৎ করে সমুদ্র উপকূল সংলগ্ন এলাকা জলোচ্ছ্বাসে প্লাবিত হয়।

সুনামি (Tsunami)

সুনামি (Tsunami) একটি জাপানি শব্দ। জাপানি ভাষায় এর অর্থ হলো ‘পোতাশ্রয়ের ঢেউ’। সুনামির পানির ঢেউ সমুদ্রের স্বাভাবিক ঢেউয়ের মতো নয়। এটা সাধারণ ঢেউয়ের চেয়ে অনেক বিশালাকৃতির। অতি দ্রুত ফুঁসে ফুলে ওঠা জোয়ারের মতো যা উপকূল ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় জলোচ্ছ্বাসের সৃষ্টি করে। সুনামির পানির ঢেউগুলো একের পর এক উঁচু হয়ে আসতেই থাকে তাই একে ঢেউয়ের রেলগাড়ি বা ‘ওয়েভ ট্রেন’ বলে। সুনামি হলো পানির এক মারাত্মক ঢেউ যা সমুদ্রের মধ্যে বা বিশাল হ্রদে ভূমিকম্প বা আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের কারণে সৃষ্টি হয়ে থাকে। পানির নিচে কোনো পারমাণবিক বা অন্য কোনো বিস্ফোরণ, ভূপাত ইত্যাদি কারণেও সুনামি হতে পারে।

সুনামির ক্ষয়ক্ষতি সমুদ্র উপকূলীয় এলাকাগুলোতে সীমাবদ্ধ থাকলেও এর আশেপাশে সুনামির ধ্বংসাত্মক লীলা সংঘটিত হয়। ২০০৪ সালের ২৬শে ডিসেম্বর ভারত মহাসাগরে যে সুনামি সৃষ্টি হয় তা এই মহাসাগরের আশেপাশে ১৪টি দেশে আঘাত হানে এবং মারাত্মক একটি দুর্যোগ সৃষ্টি করে।

কাজ : ২০০৪ ও ২০১১ সালে এশিয়ায় দুটি সুনামি হয়। তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত দেশের তালিকা দলগতভাবে তৈরি কর।

আগ্নেয়গিরি (Volcano)



চিত্র ৪.৪ : আগ্নেয়গিরি

ভূত্বকের শিলাস্তর সর্বত্র একই ধরনের কঠিন বা গভীর নয়। কোথাও নরম আবার কোথাও কঠিন। কোনো কোনো সময় ভূগর্ভের চাপ প্রবল হলে শিলাস্তরের কোনো দুর্বল অংশ ফেটে যায় বা সুড়ঙ্গের সৃষ্টি হয়। ভূপৃষ্ঠের দুর্বল অংশের ফাটল বা সুড়ঙ্গ দিয়ে ভূগর্ভের উষ্ণ বায়ু, গলিত শিলা, ধাতু, ভস্ম, জলীয়বাষ্প, উত্তপ্ত পাথরখণ্ড, কাদা, ছাই প্রভৃতি প্রবলবেগে উর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হয়। ভূপৃষ্ঠে ঐ ছিদ্রপথ বা ফাটলের চারপাশে ক্রমশ জমাট বেঁধে যে উঁচু মোচাকৃতি পর্বত সৃষ্টি করে তাকে আগ্নেয়গিরি বলে। আগ্নেয়গিরির মুখকে জ্বালামুখ এবং জ্বালামুখ দিয়ে নির্গত গলিত পদার্থকে লাভা বলে (চিত্র ৪.৪)।

আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের কারণ (Reasons of Volcanism)

- (১) ভূত্বকে দুর্বল স্থান বা ফাটল দিয়ে ভূঅভ্যন্তরের গলিত ম্যাগমা, ভস্ম, ধাতু প্রবলবেগে বের হয়ে অগ্ন্যুৎপাত ঘটায়।
- (২) যখন ভূপৃষ্ঠের চাপ কমে যায় তখন ভূগর্ভের শিলাসমূহ স্থিতিস্থাপক অবস্থা থেকে তরল অবস্থায় পরিণত হয়। এতে শিলার আয়তন বৃদ্ধি পায়। ফলে তরল পদার্থ দুর্বল স্থান ভেদ করে প্রবলবেগে উৎক্ষিপ্ত হয়ে অগ্ন্যুৎপাতের সৃষ্টি করে।
- (৩) কখনো কখনো ভূত্বকের ফাটল দিয়ে নদী-নালা, খাল-বিল এবং সমুদ্রের পানি ভূগর্ভে প্রবেশ করলে প্রচণ্ড উত্তাপে বাষ্পীভূত হয়। ফলে আয়তন বৃদ্ধি পেয়ে ভূত্বক ফাটিয়ে দেয়। তখন ঐ ফাটলের ভিতর দিয়ে পানি, বাষ্প, তপ্ত শিলা প্রভৃতি নির্গত হয়ে অগ্ন্যুৎপাত ঘটায়।
- (৪) ভূগর্ভে নানা রাসায়নিক ক্রিয়া ও বিভিন্ন তেজস্ক্রিয় পদার্থের প্রভাবে প্রচুর তাপ বৃদ্ধি পেয়ে গ্যাসের সৃষ্টি হয়। তাতে ভূঅভ্যন্তরের চাপ বৃদ্ধি পায় এবং অগ্ন্যুৎপাত ঘটায়।
- (৫) ভূআন্দোলনের সময় পার্শ্বচাপে ভূত্বকের দুর্বল অংশ ভেদ করে এ উত্তপ্ত তরল লাভা উপরে উঠিত হয়। এভাবে ভূআন্দোলনের ফলেও অগ্ন্যুৎপাত হয়।

আগ্নেয়গিরির প্রকারভেদ (Types of Volcano) : অগ্ন্যুৎপাতের ভিত্তিতে আগ্নেয়গিরিকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা হয়।

১। **সক্রিয় আগ্নেয়গিরি (Active volcano) :** যেসব আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত এখনও বন্ধ হয়নি, তাকে সক্রিয় আগ্নেয়গিরি বলে। যেমন- হাওয়াই দ্বীপের মাওনালেয়া ও মাওনাকিয়া।

২। **সুপ্ত আগ্নেয়গিরি (Dormant volcano) :** যেসব আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত অনেককাল আগে বন্ধ হয়ে গেছে; তাদেরকে সুপ্ত আগ্নেয়গিরি বলে। যেমন- জাপানের ফুজিয়ামা।

৩। **মৃত আগ্নেয়গিরি (Extinct volcano) :** যেসব আগ্নেয়গিরি দীর্ঘকাল ধরে নিষ্ক্রিয় হয়ে আছে এবং ভবিষ্যতেও অগ্ন্যুৎপাতের সম্ভাবনা নেই, সেগুলোকেই মৃত আগ্নেয়গিরি বলে। যেমন- ইরানের কোহিসুলতান।

আকার ও আকৃতির উপর ভিত্তি করে আগ্নেয়গিরিকে নিম্নলিখিতভাবে শ্রেণিবিন্যাস করা হয়েছে।

১। **শিল্ড আগ্নেয়গিরি (Shield volcano) :** গম্বুজ আকৃতির শিল্ড আগ্নেয়গিরিগুলোর তলদেশ চওড়া এবং ঢাল সামান্য, সাধারণত আকারে বৃহৎ। এ জাতীয় আগ্নেয়গিরি কেন্দ্রীয় নির্গমনপথে বা সারি সারি নির্গমনপথ দিয়ে দ্রুত বেগে প্রবাহিত বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ানো লাভা দ্বারা গঠিত। হাওয়াই দ্বীপের মাওনালেয়া এর উদাহরণ।

২। **স্ট্র্যাটো আগ্নেয়গিরি (Strato volcano) :** জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরি থেকে নির্গত ভস্ম ও লাভার সমন্বয়ে স্তরসমূহ দ্বারা এ জাতীয় আগ্নেয়গিরি গঠিত হয়। অধিকাংশ স্ট্র্যাটো আগ্নেয়গিরি অনিয়মিতভাবে গঠিত পর্বতসমূহ যা পর্বত পার্শ্বে উৎপন্ন কেন্দ্রীয় এবং অন্যান্য নির্গমনপথ দিয়ে প্রবাহিত বিক্ষিপ্ত পদার্থের সমন্বয়ে গঠিত।

৩। **সিভার কোণ আগ্নেয়গিরি (Cinder cone volcano) :** আকারে ছোট আগ্নেয়গিরিগুলোকে সিভার কোণ আগ্নেয়গিরি বলা হয়। এগুলো গ্যাসপূর্ণ ম্যাগমার পুনঃপুন ক্ষুদ্র বিস্ফোরণের ফল, যেগুলো লাভা ও ভস্মও সামান্য পরিমাণ নিক্ষেপ করে নির্গমনপথের আশপাশের ছোট এলাকায়। সিভার কোণ আগ্নেয়গিরি এর গড় আকৃতি প্রায় ৮০০ মিটার চওড়া তল এবং ১০০ মিটার উঁচু। মেক্সিকোর পেরিকোটিন এর উদাহরণ।

আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলাফল (Effects of Volcanism) : আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে ভূপৃষ্ঠের অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়। অন্যদিকে ক্ষয়ক্ষতির সঙ্গে সঙ্গে কোনো কোনো স্থানে এর দ্বারা সামান্য সুফলও পাওয়া যায়। নিম্নে আগ্নেয়গিরির ফলাফলের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হলো :

১। অনেক সময় আগ্নেয়গিরি থেকে নির্গত পদার্থ চারদিকে সঞ্চিত হয়ে মালভূমির সৃষ্টি করে। ভারতের দাক্ষিণাত্যের কৃষ্ণমন্ডিকাময় মালভূমি এরূপ নির্গত লাভা দিয়ে গঠিত।

২। সমুদ্র তলদেশেও অনেক আগ্নেয়গিরি আছে। এ থেকে নির্গত লাভা সঞ্চিত হয়ে দ্বীপের সৃষ্টি হয়। প্রশান্ত মহাসাগরের হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ এভাবে সৃষ্ট একটি আগ্নেয় দ্বীপ।

৩। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে ভূপৃষ্ঠের কোনো অংশ ধসে গভীর গহ্বরের সৃষ্টি হয়। ১৮৮৩ সালে সুমাত্রা ও জাভা দ্বীপের মধ্যবর্তী অংশে অগ্ন্যুৎপাতের ফলে এক বিরাট গহ্বর দেখা যায়।

৪। মৃত আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখে পানি জমে আগ্নেয় হ্রদের সৃষ্টি করে। আলাস্কার মাউন্ট আডাকামা, নিকারাগুয়ার কোসেগায়না এ ধরনের হ্রদ।

৫। আগ্নেয়গিরির নির্গত লাভা, শিলা দ্রব্য প্রভৃতি দীর্ঘকাল ধরে একটা স্থানে সঞ্চিত হয়ে পর্বতের সৃষ্টি করে। এ ধরনের পর্বতকে আগ্নেয় পর্বত বলে। যেমন- ইতালির ভিসুভিয়াস।

৬। অনেক সময় আগ্নেয়গিরির লাভা সঞ্চিত হতে হতে বিস্তৃত এলাকা নিম্ন সমভূমিতে পরিণত হয়। যেমন- উত্তর আমেরিকার স্নেক নদীর লাভা সমভূমি।

আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে লাভা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে গ্রাম, নগর, কৃষিক্ষেত্র সব ধ্বংস করে। ১৮৭৯ সালে ইতালির ভিসুভিয়াস আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে হারকিউলেনিয়াম ও পম্পেই নামের দুটি নগর উত্তপ্ত লাভা ও ভস্মরাশির মধ্যে ডুবে গিয়েছিল।

আগ্নেয়গিরির কারণে কেবল মানুষের অপকার নয় উপকারও হয়ে থাকে। এতে ভূমির উর্বরতাও বৃদ্ধি পায়। যেমন- দাক্ষিণাত্যের লাভা গঠিত কৃষ্ণমৃত্তিকা কার্পাস চাষের জন্য বিশেষ উপযোগী।

অনেক সময় লাভার সঙ্গে অনেক খনিজ পদার্থ নির্গত হয়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমাংশে অগ্ন্যুৎপাতের জন্য অধিক পরিমাণে খনিজ দ্রব্য পাওয়া যায়। অগভীর সমুদ্রে বা হ্রদে লাভা ও ভস্ম সঞ্চিত হয়ে এরূপ ভূভাগ সৃষ্টি হয়।

ভূপৃষ্ঠের ধীর পরিবর্তনের কারণ ও ফলাফল (Cause and effect of slow changes of the earth's surface)

আমরা জানি পৃথিবীর আকস্মিক পরিবর্তনের জন্য তিনটি প্রধান ভূমিরূপের সৃষ্টি হয়। তা হলো- পর্বত, মালভূমি এবং সমভূমি। এসব ভূমিরূপ বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক শক্তি যেমন- সূর্যতাপ, বায়ু, বৃষ্টি, নদী প্রভৃতি দ্বারা খুব ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়ে নতুন ভূমিরূপে পরিণত হয়। এই পরিবর্তন প্রক্রিয়াকে ধীর পরিবর্তন বলে। এতে সূর্যতাপ, বায়ু, বৃষ্টি, নদী প্রভৃতি শক্তি খুব ধীরে ধীরে ভূত্বকের ক্ষয়সাধন করে থাকে। ফলে ভূত্বকের উপরিস্থিত শিলা ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়। এই শিলা অপসারিত হয়, আবার নতুন করে শিলা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়। এভাবে পর্যায়ক্রমে প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে ভূমি ক্ষয়প্রাপ্ত হতে থাকে।

যেসব প্রক্রিয়ায় ভূমিরূপের ধীর পরিবর্তন হচ্ছে তাদেরকে প্রধানত চারটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়।

(ক) বিচূর্ণীভবন ও ক্ষয়ীভবন (Weathering and Erosion)

(খ) অপসারণ (Transpiration)

(গ) নগ্নীভবন (Denudation)

(ঘ) অবক্ষেপণ (Deposition)

(ক) বিচূর্ণীভবন ও ক্ষয়ীভবন : শিলারাশির চূর্ণ-বিচূর্ণ ও বিশ্লিষ্ট হওয়া কিন্তু স্থানান্তর না হলে তাকে বিচূর্ণীভবন বলে। সাধারণত প্রাকৃতিক কারণে শিলা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়।

বায়ুপ্রবাহ, নদীস্রোত ও হিমবাহ দ্বারা শিলা ক্ষয়সাধন হয়। যে প্রক্রিয়ায় শিলাখণ্ড স্থানান্তরিত হয় তাকে ক্ষয়ীভবন বলে।

(খ) অপসারণ : নদীস্রোত, বায়ুপ্রবাহ ও হিমবাহ প্রভৃতি শক্তির দ্বারা চূর্ণ-বিচূর্ণ পদার্থগুলো স্থানান্তরিত হয়। একে অপসারণ বলে।

(গ) নগ্নীভবন : বিচূর্ণীভবনের সময় শিলা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়। ক্ষয়ীভবন দ্বারা ঐ শিলা অপসারিত হলে নিচের অবিকৃত শিলাগুলো নগ্ন হয়ে পড়ে। এরূপ কার্যকে নগ্নীভবন বলে।

(ঘ) অবক্ষেপণ : বায়ুপ্রবাহ, নদীস্রোত, হিমবাহ প্রভৃতি শক্তির প্রভাবে নানা স্থান থেকে ক্ষয়প্রাপ্ত শিলাগুলো যে প্রক্রিয়ায় কোনো একস্থানে এসে জমা হয়ে নতুন ভূমিরূপের সৃষ্টি করে তাকে অবক্ষেপণ বলে।

যেসব প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে ক্ষয়ীভবনের মধ্য দিয়ে ধীর পরিবর্তন সংঘটিত হয় তাদের মধ্যে বায়ু, বৃষ্টিপাত, নদী, হিমবাহ প্রভৃতি প্রধান। এদের ক্ষয়কার্য নিম্নে আলোচিত হলো :

বায়ুর কাজ : বায়ুতে থাকা অক্সিজেন, কার্বন ডাইঅক্সাইড ও জলীয়বাষ্প রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় শিলার বিচ্ছেদ ও ক্ষয়সাধন করে। বায়ুর ক্ষয়কার্য মরুভূমিতে অধিক দেখা যায়। মরু এলাকা শুষ্ক, প্রায় বৃষ্টিহীন এবং গাছপালা শূন্য। মরু এলাকায় গাছপালা কম থাকার কারণে মৃত্তিকা সুদৃঢ় নয়। এছাড়া দিনের বেলায় সূর্যের তাপে এবং রাতের শীতলতায় শিলার সংকোচন ও প্রসারণের ফলেও সংবন্ধতা শিথিল হয়ে যায়। এরপর বায়ুপ্রবাহের আঘাতে এ অঞ্চলের শিলা সহজেই বাহিত হয়ে ধীর পরিবর্তনের মাধ্যমে ক্ষয়সাধন করে।

বৃষ্টির কাজ : বৃষ্টির পানি ভূপৃষ্ঠের উপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার সময় ভূপৃষ্ঠকে ব্যাপকভাবে ক্ষয় করে। প্রবাহিত হওয়ার সময় পানি শিলাকে আংশিকভাবে ক্ষয় ও আলগা করে এবং ক্ষয়প্রাপ্ত শিলাকে প্রসারিত করে। বৃষ্টিবহুল অঞ্চলে কর্ষিত জমির মাটি বৃষ্টির পানির দ্বারা অপসারিত হয়। আবার পর্বতের মধ্যে কর্দম স্তরের উপর অনেক ভারী শিলা হেলানো অবস্থায় থাকে। পর্বতের ফাটল দিয়ে পানি প্রবেশ করে কাদার স্তরকে গলিয়ে দেয়, এতে বড় শিলাস্তর কাদার উপর থাকতে না পেরে নিচে ধসে পড়ে। একে মৃত্তিকা পাত বলে। এভাবে অনেকদিন ধরে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে ধীর পরিবর্তন হয়।

হিমবাহের কাজ : হিমবাহের দ্বারাও ভূপৃষ্ঠের কোনো কোনো অঞ্চল ব্যাপকভাবে ক্ষয় হয়ে থাকে। হিমবাহের নিচে নামার সময় এর নিচের প্রস্তরখন্ড পর্বতগাত্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অনেক দূরে গিয়ে পতিত হয়। পর্বতগাত্রের মধ্যে ছিদ্র যদি থাকে তাহলে তার ভিতর পানি প্রবেশ করে বরফে পরিণত হয়ে প্রস্তরগুলোকে আলগা করে দেয়। ফলে হিমবাহের চাপে এটি পর্বতগাত্র থেকে খুব সহজেই পৃথক হয়ে যায়। এই হিমবাহ অনেকদিন ধরে ধীরে ধীরে হয় বলে এটি ভূপৃষ্ঠের ধীর পরিবর্তনের একটি উদাহরণ।

নদীর কাজ : যেসব প্রাকৃতিক শক্তি ভূপৃষ্ঠে প্রতিনিয়ত ধীর পরিবর্তন করছে তাদের মধ্যে নদীর কাজ অন্যতম। নদী যখন পর্বতের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয় তখন স্রোতের আঘাতে বাহিত নুড়ি, কর্দম প্রভৃতির ঘর্ষণে নদীগর্ভ ও পার্শ্বক্ষয় হয়। পার্বত্য অবস্থায় নদীর স্রোতের বেগ বেশি থাকে। এতে নদী নিচের দিকে অগ্রসর হতে থাকে এবং কোনো সঞ্চয় হতে পারে না। যখন নদী সমভূমিতে আসে তখন নদী ক্ষয় এবং সঞ্চয় দুটোই করে। নদীর চলার পথে যেখানে নরম শিলা পাবে নদী ঠিক সেদিক দিয়ে ক্ষয় করে অগ্রসর হয়। ক্ষয়কৃত নরম শিলা অবক্ষিপণ করে বিভিন্ন ভূমিরূপ গঠন করে। এভাবে নদী ক্ষয় ও সঞ্চয় করতে করতে সমুদ্রে গিয়ে পড়ে। অনেকদিন ধরে এভাবে ক্ষয় ও সঞ্চয় কাজ চলে বলে একে নদীর দ্বারা ধীর পরিবর্তন বলে।

নদীর সংজ্ঞা : নদীর গতিপথ সম্পর্কে বুঝতে হলে প্রথমে আমাদের জানতে হবে নদী কাকে বলে? উঁচু পর্বত, মালাভূমি বা উঁচু কোনো স্থান থেকে বৃষ্টি, প্রস্রবণ, হিমবাহ বা বরফ গলা পানির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতধারার মিলিত প্রবাহ যখন মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে নির্দিষ্ট খাতে প্রবাহিত হয়ে সমভূমি বা নিম্নভূমির উপর দিয়ে কোনো বিশাল জলাশয় বা হ্রদ অথবা সমুদ্রের সঙ্গে মিলিত হয়, তখন তাকে নদী বলে। যেখান থেকে নদীর উৎপত্তি হয় তাকে নদীর উৎস বলে। নদী যখন কোনো হ্রদ বা সাগরে এসে পতিত হয়, তখন সেই পতিত স্থানকে মোহনা বলে। নদীর অধিক বিস্তৃত মোহনাকে খাঁড়ি বলে।

নদীর গতিপথ : আমাদের জীবনে নদীর গুরুত্ব অপরিসীম। প্রাচীন যতগুলো শহর দেখতে পাই তার সবগুলোই নদীর পাশে অবস্থিত। কেননা অতীতে মানুষ পানিপথেই চলাফেরা করত সবচেয়ে বেশি। নদীর গতি ও কাজ সম্পর্কে জানতে হলে নদী বিষয়ে আরও কিছু মৌলিক ধারণা থাকা দরকার। এগুলো হলো—

দোয়াব : প্রবাহমান দুটি নদীর মধ্যবর্তী ভূমিকে দোয়াব বলে।

নদীসংগম : দুই বা ততোধিক নদীর মিলনস্থলকে নদীসংগম বলে।

উপনদী : পর্বত বা হ্রদ থেকে যেসব ছোট নদী উৎপন্ন হয়ে কোনো বড় নদীতে পতিত হয় তাকে সেই বড় নদীর উপনদী বলে। বাংলাদেশের তিস্তা ও করতোয়া হলো যমুনা নদীর উপনদী।

শাখানদী : মূল নদী থেকে যে সকল নদী বের হয় তাকে শাখানদী বলে। বাংলাদেশের কুমার ও গড়াই হলো পদ্মা নদীর শাখানদী।

নদী উপত্যকা : যে খাতের মধ্য দিয়ে নদী প্রবাহিত হয় সে খাতকে উক্ত নদীর উপত্যকা বলে।

নদীগর্ভ : নদী উপত্যকার তলদেশকে নদীগর্ভ বলে।

নদী অববাহিকা : উৎপত্তি স্থান থেকে শাখাপ্রশাখার মাধ্যমে যে বিস্তীর্ণ অঞ্চল দিয়ে পানি প্রবাহিত হয়ে সমুদ্র বা হ্রদে পতিত হয় সেই সমগ্র অঞ্চলই নদীর অববাহিকা।

নদীর বিভিন্ন গতি বা অবস্থা (Life cycle of a river)

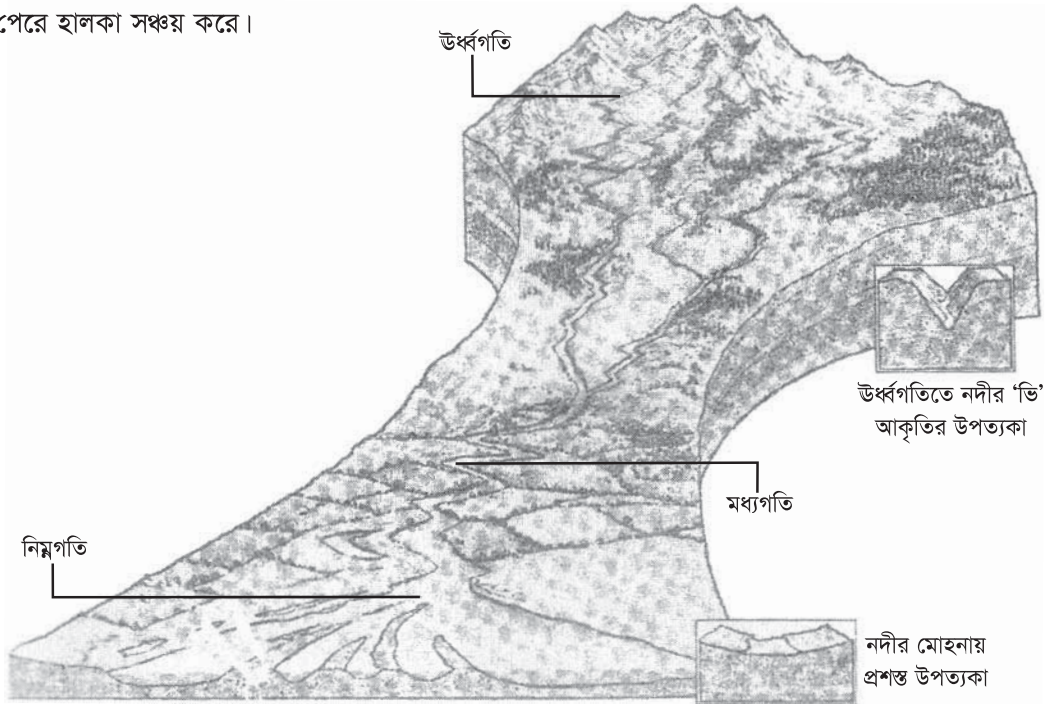
উৎস থেকে মোহনা পর্যন্ত নদীর গতিপথের আয়তন, গভীরতা, ঢাল, স্রোতের বেগ প্রভৃতির উপর ভিত্তি করে নদীর গতিপথকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় (চিত্র ৪.৫)। যথা—

(ক) উর্ধ্বগতি (Youthful Stage/ Upper Course)

(খ) মধ্যগতি (Mature Stage/ Middle Course)

(গ) নিম্নগতি (Old Stage/ Lower Course)

(ক) **উর্ধ্বগতি :** উর্ধ্বগতি হলো নদীর প্রাথমিক অবস্থা। পর্বতের যে স্থান থেকে নদীর উৎপত্তি হয়েছে সেখান থেকে সমভূমিতে পৌঁছানো পর্যন্ত অংশকে নদীর উর্ধ্বগতি বলে। উর্ধ্বগতিতে নদীর প্রধান কাজ হলো ক্ষয়সাধন। উর্ধ্বগতি অবস্থায় নদী স্থলভাগকে ক্ষয় করে এবং তা পরিবহন করে। এ অবস্থায় নদীর প্রধান কাজ ক্ষয় করা হলেও অনেক সময় নদীর ঢাল কমে গেলে হঠাৎ অধিক পরিমাণে পাথরের টুকরা এলে নদী তখন তা বহন করতে না পেরে হালকা সঞ্চয় করে।



চিত্র ৪.৫ : নদীর বিভিন্ন অবস্থা

(খ) মধ্যগতি : পার্বত্য অঞ্চল পার হয়ে নদী যখন সমভূমির উপর দিয়ে প্রবাহিত হয় তখন এর প্রবাহকে মধ্যগতি বলে। মধ্যগতিতে নদীর বিস্তার উর্ধ্বগতি অবস্থার তুলনায় অনেক বেশি হয় কিন্তু গভীরতা উর্ধ্বগতি অবস্থার তুলনায় অনেক কমে যায়। মধ্যগতি অবস্থায় নদীর সঞ্চয় কাজ শুরু হয়। মধ্যগতিতে নদীর দুদিকের নিম্নভূমি পলি দ্বারা ভরাট হয়ে প্রায় সমতলভূমিতে পরিণত হয়। একে প্লাবন সমভূমি বলে। বাংলাদেশের অধিকাংশ স্থানই এক বিস্তীর্ণ প্লাবন সমভূমি।

(গ) নিম্নগতি : নদীর জীবনচক্রের শেষ পর্যায়ে হলো নিম্নগতি। এ অবস্থায় স্রোত একেবারে কমে যায়। নিম্নক্ষয় বন্ধ ও পার্শ্বক্ষয় হয় অল্প পরিমাণে। নদী উপত্যকা খুব চওড়া ও অগভীর হয়। স্রোতের বেগ কমে যাওয়ায় পানিবাহিত বালুকণা, কাদা নদীগর্ভে ও মোহনায় সঞ্চিত হয়।

নদী দ্বারা সৃষ্ট ভূমিরূপ

নদী দুইভাবে ভূমিরূপের সৃষ্টি করে। একটি হলো এর ক্ষয়কার্য ও অপরটি হলো এর সঞ্চয়কার্য। নিম্নে নদীর ক্ষয়জাত ও সঞ্চয়জাত ভূমিরূপ বর্ণনা করা হলো।

নদীর ক্ষয়জাত ভূমিরূপ (Landforms from river erosion)

‘ভি’ আকৃতির উপত্যকা (‘V’ Shaped Valley) : উর্ধ্বগতি অবস্থায় নদীর স্রোতের বেগ প্রবল হওয়ার কারণে নদী বড় বড় শিলাখণ্ডকে বহন করে নিচের দিকে অগ্রসর হয়। পর্বতগুলো কাঠিন শিলা দ্বারা গঠিত হলেও মাঝে মাঝে নরম শিলাও থাকে। নদীখাতে পার্শ্ব অপেক্ষা নিম্নদিকের শিলা বেশি কোমল বলে পার্শ্বক্ষয় অপেক্ষা নিম্নক্ষয় বেশি হয়। এভাবে ক্রমশ ক্ষয়ের ফলে নদী উপত্যকা অনেকটা ইংরেজি ‘V’ আকৃতি হয়। তাই একে ‘ভি’ আকৃতির উপত্যকা বলে (চিত্র ৪.৬)।



চিত্র ৪.৬ : ‘ভি’ আকৃতির উপত্যকা

গিরিখাত ও ক্যানিয়ন (Gorge and Canyon) : উর্ধ্বগতি অবস্থায় নদীর প্রবল স্রোত খাড়া পর্বতগাত্র বেয়ে নিচের দিকে প্রবাহিত হয়। এতে ভূপৃষ্ঠ ক্ষয় হয় এবং ভূত্বক থেকে শিলাখণ্ড ভেঙে পড়ে। শিলাগুলো পরস্পরের সঙ্গে



গিরিখাত

চিত্র ৪.৭ : গিরিখাত

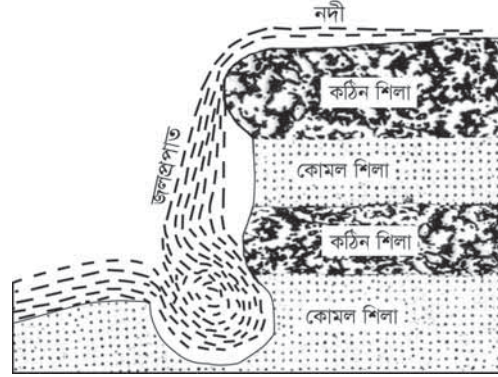
এবং নদীখাতের সঙ্গে সংঘর্ষে মসৃণ হয়ে অনেক দূর চলে যায়। এসব পাথরের সংঘর্ষে নদীর খাত গভীর ও সংকীর্ণ হতে থাকে। নদীর দুপাশের ভূমি ক্ষয় কম হলে বা না হলে এসব খাত খুব গভীর ও সংকীর্ণ হতে থাকে। এক পর্যায়ে এসব খাত খুব গভীর হয়। তখন এরূপ খাতকে গিরিসংকট বা গিরিখাত বলে (চিত্র ৪.৭)।

সিন্ধু নদের গিরিখাতটি প্রায় ৫১৮ মিটার গভীর। এটি পৃথিবীর একটি অন্যতম বৃহৎ গিরিখাত।

নদী যখন শূষ্ক অঞ্চল দিয়ে প্রবাহিত হয় এবং সেখানে যদি কোমল শিলার স্তর থাকে তাহলে গিরিখাতগুলো অত্যন্ত সংকীর্ণ ও গভীর হয়। এরূপ গিরিখাতকে ক্যানিয়ন বলে। উত্তর আমেরিকার কলোরাদো

নদীর গিরিখাত গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন (Grand Canyon) পৃথিবী বিখ্যাত। এটি ১৩৭-১৫৭ মিটার বিস্তৃত, প্রায় ২.৪ কিলোমিটার গভীর ও ৪৮২ কিলোমিটার দীর্ঘ।

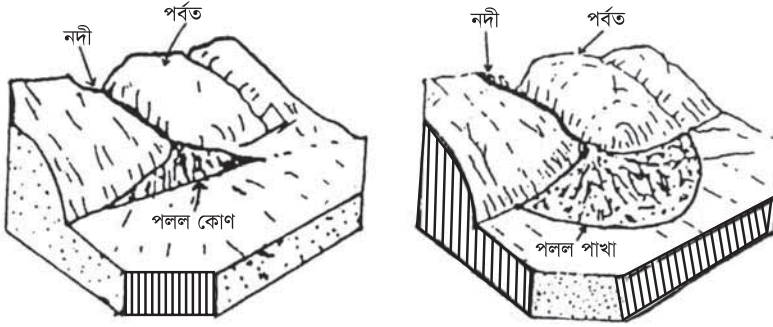
জলপ্রপাত (Waterfall) : উর্ধ্বগতি অবস্থায় নদীর পানি যদি পর্যায়ক্রমে কঠিন শিলা ও নরম শিলার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয় তাহলে কোমল শিলাস্তরটিকে বেশি পরিমাণে ক্ষয় করে ফেলে। এর ফলে নরম শিলাস্তরের তুলনায় কঠিন শিলাস্তর অনেক উপরে অবস্থান করে এবং পানি খাড়াভাবে নিচের দিকে পড়তে থাকে। এরূপ পানির পতনকে জলপ্রপাত বলে (চিত্র ৪.৮)। উত্তর আমেরিকার সেন্ট লরেন্স নদীর বিখ্যাত ন্যায়াগ্রা জলপ্রপাত এরূপে গঠিত হয়েছে।



চিত্র ৪.৮ : জলপ্রপাত

নদীর সঞ্চয়জাত ভূমিরূপ (Landforms from river deposition)

পলল কোণ ও পলল পাখা (Alluvial Cone and Alluvial Fan) : পাবর্ত্য কোনো অঞ্চল থেকে হঠাৎ করে কোনো নদী যখন সমভূমিতে পতিত হয়, তখন শিলাচূর্ণ, পলিমাটি প্রভৃতি পাহাড়ের পাদদেশে সমভূমিতে সঞ্চিত হয়ে ত্রিকোণ ও হাতপাখার ন্যায় ভূখন্ডের সৃষ্টি হয়। এ কারণে এরূপ পললভূমিকে পলল কোণ বা পলল পাখা বলে (চিত্র ৪.৯)।



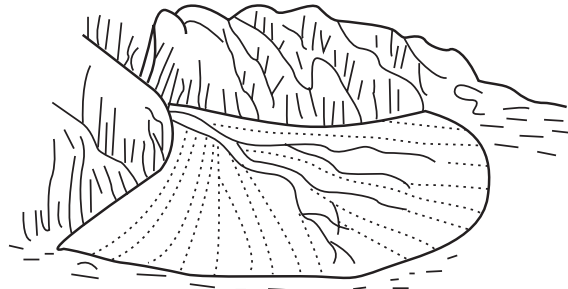
চিত্র ৪.৯ : পলল কোণ ও পলল পাখা

যেসব অঞ্চলে মাটি অধিক পানি শোষণ করতে পারে সেসব অঞ্চলে পানি শোষণের ফলে শিলাচূর্ণ অধিক দূরত্বে যেতে পারে না এবং সেসব অঞ্চলের সঞ্চয় প্রশস্ত না হয়ে কোণাকৃতি হয়। একে পলল কোণ বলে। পানি বেশি শোষণ কতে না পারলে শিলাচূর্ণ বিস্তৃত হয়ে হাতপাখার

ন্যায় ভূখন্ডের সৃষ্টি হয়। এরূপ পললভূমিকে পলল পাখা বলে। হিমালয়ের পাদদেশে গঙ্গার বিভিন্ন উপনদীর গতিপথে এরূপ ভূখন্ড দেখতে পাওয়া যায়।

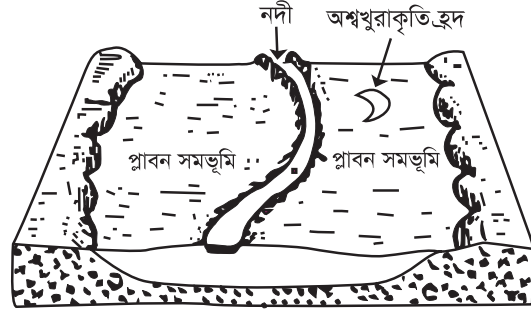
পাদদেশীয় পলল সমভূমি (Pedmont Alluvial Plain)

: অনেক সময় পাহাড়িয়া নদী পাদদেশে পলি সঞ্চয় করতে করতে একটা সময় পাহাড়ের পাদদেশে নতুন বিশাল সমভূমি গড়ে তোলে। এ ধরনের সমভূমিকে পাদদেশীয় পলল সমভূমি বলে (চিত্র ৪.১০)। বাংলাদেশের তিস্তা, আত্রাই, করতোয়া সংলগ্ন রংপুর ও দিনাজপুর জেলার অধিকাংশ স্থানই পলল সমভূমি নামে পরিচিত। এসব নদী উত্তরের হিমালয় থেকে উৎপন্ন হয়ে সহজেই পাহাড় থেকে পলল বহন করে এ অঞ্চলে সঞ্চয় করে পাদদেশীয় পললভূমি গঠন করেছে।



চিত্র ৪.১০ : পাদদেশীয় পলল সমভূমি

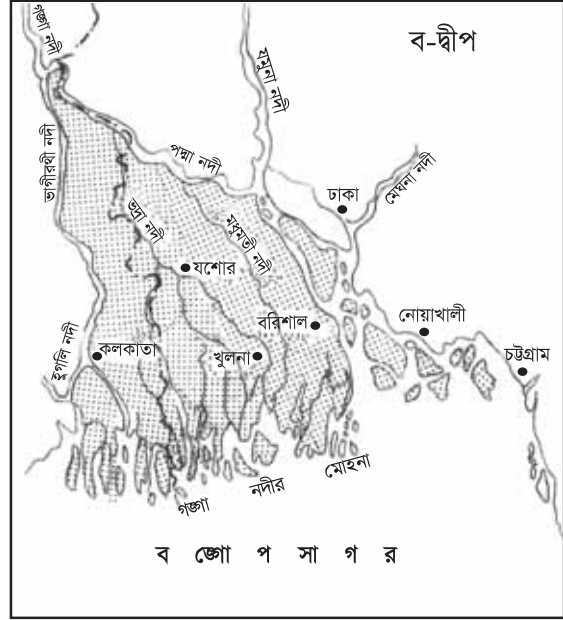
প্লাবন সমভূমি (Flood Plain) : বর্ষাকালে বিশেষ করে পানি বৃদ্ধির কারণে নদীর উভয়কূল প্লাবিত করে তখন তাকে প্লাবন বা বন্যা বলে। বন্যা শেষে নদীর দুপাশের ভূমিতে খুব পুরু স্তর কাদা, পলি দেখতে পাওয়া যায়। এভাবে অনেকদিন পলি জমতে জমতে যে বিস্তৃত সমভূমির সৃষ্টি হয় তাকে প্লাবন সমভূমি বলে (চিত্র ৪.১১)। সমভূমি বলা হলেও এর কোথাও কোথাও সামান্য উঁচুনিচু দেখা যায়।



চিত্র ৪.১১ : প্লাবন সমভূমি

কয়েকটি জেলা ব্যতীত মোটামুটি সমগ্র বাংলাদেশই পদ্মা, যমুনা, মেঘনা প্রভৃতি নদীবিধৌত প্লাবন সমভূমি। প্লাবন সমভূমির মধ্যে অনেক ধরনের সঞ্চয়জাত ভূমিরূপ দেখা যায়। এদের মধ্যে প্রধান কয়েকটি হলো- (ক) অশ্বখুরাকৃতি হ্রদ, (খ) বালুচর, (গ) প্রাকৃতিক বাঁধ।

ব-দ্বীপ (Delta) : নদী যখন মোহনার কাছাকাছি আসে তখন তার স্রোতের বেগ একেবারেই কমে যায়। এতে বালি ও কাদা তলানিরূপে সঞ্চিত হয়। নদীর স্রোতটান যদি কোনো সাগরে এসে পতিত হয় তাহলে ঐ সমস্ত বালি, কাদা নদীর মুখে জমে নদীমুখ প্রায় বন্ধ হয়ে যায় এবং ধীরে ধীরে এর স্তর সাগরের পানির উচ্চতার উপরে উঠে যায়। তখন নদী বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হয়ে এই চরাভূমিকে বেষ্টিত করে সাগরে পতিত হয়। ত্রিকোণাকার এই নতুন সমতলভূমিকে ব-দ্বীপ বলে (চিত্র ৪.১২)। এটি দেখতে মাত্রাহীন বাংলা ব এর মতো এবং গ্রিক শব্দ 'ডেল্টা'র মতো তাই এর বাংলা নাম ব-দ্বীপ এবং ইংরেজি নাম 'Delta' হয়েছে। হুগলি নদী থেকে পূর্ব দিকে মেঘনার সীমানা পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশে সমস্ত দক্ষিণাংশ গঙ্গা ও পদ্মা নদীর বিখ্যাত ব-দ্বীপ অঞ্চল।



চিত্র ৪.১২ : ব-দ্বীপ

পৃথিবীর বাহ্যিক গঠন (External Structure of the Earth)

পৃথিবীর উপরিভাগে বৈচিত্র্যময় ভূমিরূপসমূহই পৃথিবীর বাহ্যিক গঠন। নিম্নে প্রধান ভূমিরূপসমূহ বর্ণনা করা হলো।

পৃথিবীর প্রধান ভূমিরূপ (The Main Landforms of the Earth)

ভূপৃষ্ঠ সর্বত্র সমান নয়। এর আকৃতি, প্রকৃতি এবং গঠনগত বৈশিষ্ট্য কিছু পার্থক্য আছে। ভূমির এই আকৃতি ও গঠনগত বৈশিষ্ট্যকেই ভূমিরূপ বলে। ভূপৃষ্ঠের কোথাও রয়েছে উঁচু পর্বত, কোথাও সমতল, কোথাও পাহাড়, কোথাও মালভূমি। এছাড়া বিভিন্ন স্থানের উচ্চতা, বন্ধুরতা এবং ঢালের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। ভৌগোলিক দিক দিয়ে বিচার করলে পৃথিবীর সমগ্র ভূমিরূপকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। এগুলো হলো- (১) পর্বত, (২) মালভূমি, (৩) সমভূমি।

পর্বত (Mountains)

সমুদ্রতল থেকে অন্তত ১,০০০ মিটারের বেশি উঁচু সুবিস্তৃত ও খাড়া ঢালবিশিষ্ট শিলাস্তূপকে পর্বত বলে। সাধারণত ৬০০ থেকে ১,০০০ মিটার উঁচু স্বল্প বিস্তৃত শিলাস্তূপকে পাহাড় বলে। পর্বতের উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে কয়েক হাজার মিটার হতে পারে। পর্বতের ভূপ্রকৃতি বন্ধুর, ঢাল খুব খাড়া এবং সাধারণত চূড়াবিশিষ্ট হয়। কোনো কোনো পর্বত বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করে। যেমন- পূর্ব আফ্রিকার কিলিমানজারো। আবার কিছু পর্বত অনেকগুলো পৃথক শৃঙ্গসহ ব্যাপক এলাকা জুড়ে অবস্থান করে। যেমন- হিমালয় পর্বতমালা।

পর্বতের প্রকারভেদ (Classification of mountains)

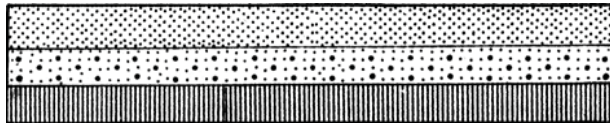
উৎপত্তিগত বৈশিষ্ট্য ও গঠনপ্রকৃতির ভিত্তিতে পর্বত প্রধানত চার প্রকার। যথা-

(ক) ভঙ্গিল পর্বত (Fold Mountains)

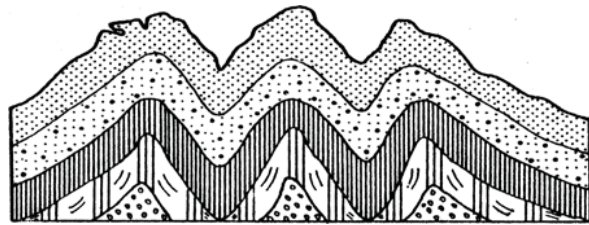
(খ) আগ্নেয় পর্বত (Volcanic Mountains)

(গ) চ্যুতি-স্তূপ পর্বত (Fault-block Mountains)

(ঘ) ল্যাকোলিথ পর্বত (Dome/Laccolith Mountains)



ভঙ্গিল পর্বত সৃষ্টির প্রাথমিক অবস্থা

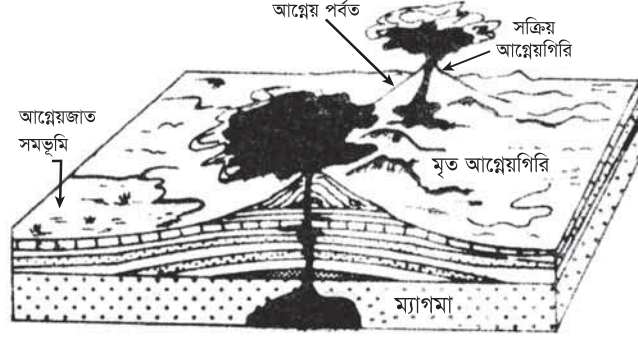


চিত্র ৪.১৩ : ভঙ্গিল পর্বত

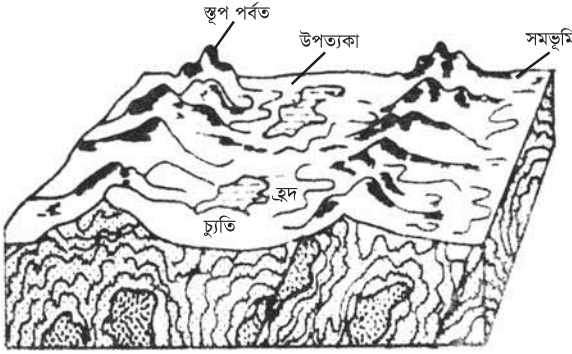
(ক) ভঙ্গিল পর্বত : ভঙ্গ বা ভাঁজ থেকে ভঙ্গিল শব্দটির উৎপত্তি। কোমল পাললিক শিলায় ভাঁজ পড়ে যে পর্বত গঠিত হয়েছে তাকে ভঙ্গিল পর্বত বলে। এশিয়ার হিমালয়, ইউরোপের আল্পস, উত্তর আমেরিকার রকি, দক্ষিণ আমেরিকার আন্দিজ পর্বত ভঙ্গিল পর্বতের উদাহরণ। ভঙ্গিল পর্বতের প্রধান বৈশিষ্ট্য ভাঁজ। ভঙ্গিল পর্বত কীভাবে সৃষ্টি হয়? সমুদ্র তলদেশের বিস্তারিত অবনমিত স্থানে দীর্ঘকাল ধরে বিপুল পরিমাণ পলি এসে জমা হয়। এর চাপে অবনমিত স্থান আরও নিচে নেমে যায়। পরবর্তী পর্যায়ে ভূআলোড়ন বা ভূমিকম্পের ফলে এবং পার্শ্ববর্তী সুদৃঢ় ভূমিখন্ডের প্রবল পার্শ্বচাপের কারণে উর্ধ্বভাঁজ ও নিম্নভাঁজের সৃষ্টি হয়। বিস্তৃত এলাকা জুড়ে এ সমস্ত উর্ধ্ব ও অধঃভাঁজ সংবলিত ভূমিরূপ মিলেই ভঙ্গিল পর্বত গঠিত হয় (চিত্র ৪.১৩)।

কাজ : পৃথিবীর প্রসিদ্ধ ভাঁজ পর্বতের তথ্য সংগ্রহ করে লেখ (দলগতভাবে)।

(খ) আগ্নেয় পর্বত : আগ্নেয়গিরি থেকে উদগিরিত পদার্থ সঞ্চিত ও জমাট বেঁধে আগ্নেয় পর্বত সৃষ্টি হয় (চিত্র ৪.১৪)। একে সঞ্চিত পর্বতও বলে। এই পর্বত সাধারণত মোচাকৃতির (Conical) হয়ে থাকে। আগ্নেয় পর্বতের উদাহরণ হলো- ইতালির ভিসুভিয়াস, কেনিয়ার কিলিমানজারো, জাপানের ফুজিয়ামা এবং ফিলিপাইনের পিনাটুবো পর্বত।



চিত্র ৪.১৪ : আগ্নেয় পর্বত



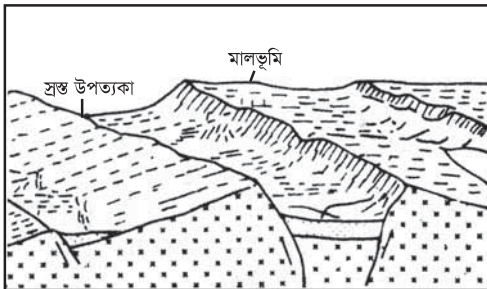
চিত্র ৪.১৫ : চ্যুতি-স্তূপ পর্বত

(গ) চ্যুতি-স্তূপ পর্বত : ভূআলোড়নের সময় ভূপৃষ্ঠের শিলাস্তরে প্রসারণ এবং সংকোচনের সৃষ্টি হয়। এই প্রসারণ এবং সংকোচনের জন্য ভূত্বকে ফাটলের সৃষ্টি হয়। কালক্রমে এ ফাটল বরাবর ভূত্বক ক্রমে স্থানচ্যুত হয়। ভূগোলের ভাষায় একে চ্যুতি বলে। ভূত্বকের এ স্থানচ্যুতি কোথাও উপরের দিকে হয়, আবার কোথাও নিচের দিকে হয়। চ্যুতির ফলে উঁচু হওয়া অংশকে স্তূপ পর্বত বলে (চিত্র ৪.১৫)। ভারতের বিষ্ণু ও সাতপুরা পর্বত, জার্মানির ব্ল্যাক ফরেস্ট, পাকিস্তানের লবণ পর্বত চ্যুতি-স্তূপ পর্বতের উদাহরণ।

(ঘ) ল্যাকোলিথ পর্বত : পৃথিবীর অভ্যন্তর থেকে গলিত শিলা বা ম্যাগমা বিভিন্ন গ্যাসের দ্বারা স্থানান্তরিত হয়ে ভূপৃষ্ঠে বের হয়ে আসার চেষ্টা করে। কিন্তু কোনো কোনো সময় বাধা পেয়ে এগুলো ভূপৃষ্ঠের উপরে না এসে ভূত্বকের নিচে একস্থানে জমাট বাঁধে। উর্ধ্বমুখী চাপের কারণে স্ফীত হয়ে ভূত্বকের অংশবিশেষ গম্বুজ আকার ধারণ করে। এভাবে সৃষ্ট পর্বতকে ল্যাকোলিথ পর্বত বলে (চিত্র ৪.১৬)। ঢাল সামান্য খাড়া স্বল্প অঞ্চলব্যাপী বিস্তৃত। এ পর্বতের কোনো শৃঙ্গ থাকে না। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের হেনরী পর্বত এর উদাহরণ।



চিত্র ৪.১৬ : ল্যাকোলিথ পর্বত

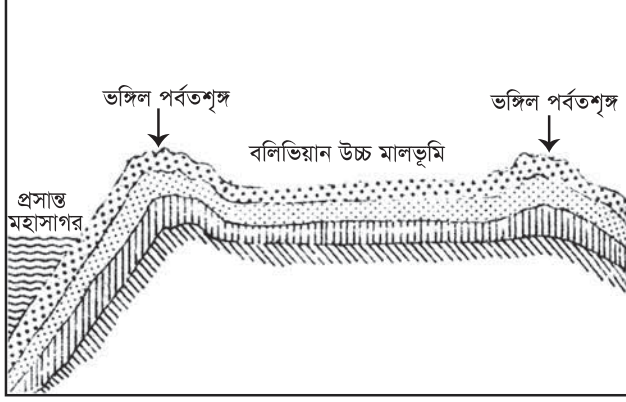


চিত্র ৪.১৭ : মালভূমি

মালভূমি (Plateaus)

পর্বত থেকে নিচু কিন্তু সমভূমি থেকে উঁচু খাড়া ঢালযুক্ত ঢেউ খেলানো বিস্তীর্ণ সমতলভূমিকে মালভূমি বলে (চিত্র ৪.১৭)। মালভূমির উচ্চতা শত মিটার থেকে কয়েক হাজার মিটার পর্যন্ত হতে পারে। পৃথিবীর বৃহত্তম মালভূমির উচ্চতা ৪,২৭০ থেকে ৫,১৯০ মিটার।

অবস্থানের ভিত্তিতে মালভূমি তিন ধরনের। যথা— (ক) পর্বতমধ্যবর্তী মালভূমি (Intermontane Plateau), (খ) পাদদেশীয় মালভূমি (Piedmont Plateau) ও (গ) মহাদেশীয় মালভূমি (Continental Plateau)।



চিত্র ৪.১৮ : পর্বতমধ্যবর্তী মালভূমি

(ক) পর্বতমধ্যবর্তী মালভূমি : এই মালভূমি পর্বতবেষ্টিত থাকে। তিব্বত মালভূমি একটি পর্বতমধ্যবর্তী মালভূমি যার উত্তরে কুনলুন ও দক্ষিণে হিমালয় পর্বত এবং পূর্ব-পশ্চিমেও পর্বত ঘিরে আছে। দক্ষিণ আমেরিকার বলিভিয়া, মধ্য আমেরিকার মেক্সিকো এবং এশিয়ার মঙ্গোলিয়া ও তারিম এ ধরনের মালভূমি (চিত্র ৪.১৮)।

(খ) পাদদেশীয় মালভূমি : উচ্চ পর্বত ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে এর পাদদেশে তলানি জমে যে মালভূমির সৃষ্টি

হয় তাকে পাদদেশীয় মালভূমি বলে। উত্তর আমেরিকার কলোরাডো এবং দক্ষিণ আমেরিকার পাতাগোনিয়া পাদদেশীয় মালভূমি।

(গ) মহাদেশীয় মালভূমি : সাগর বা নিম্নভূমি পরিবেষ্টিত বিস্তীর্ণ উচ্চভূমিকে মহাদেশীয় মালভূমি বলে। এ ধরনের মালভূমির সঙ্গে পর্বতের কোনো সংযোগ থাকে না। স্পেন, অস্ট্রেলিয়া, সৌদি আরব, গ্রিনল্যান্ড, এন্টার্কটিকা এবং ভারতীয় উপদ্বীপ এর অন্যতম উদাহরণ।

সমভূমি (Plains)

সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে অল্প উঁচু মৃদু ঢালবিশিষ্ট সুবিস্তৃত ভূমিকে সমভূমি বলে। বিভিন্ন ভূপ্রাকৃতিক প্রক্রিয়া যেমন— নদী, হিমবাহ ও বায়ুর ক্ষয় ও সঞ্চয়ক্রিয়ার ফলে সমভূমির সৃষ্টি হয়। মৃদু ঢাল ও স্বল্প বন্থুরতার জন্য সমভূমি কৃষিকাজ, বসবাস, রাস্তাঘাট নির্মাণের জন্য খুবই উপযোগী। তাই সমভূমিতে সবচেয়ে ঘন জনবসতি গড়ে উঠেছে।

উৎপত্তির ধরনের ভিত্তিতে সমভূমিকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায় যেমন— ক্ষয়জাত সমভূমি ও সঞ্চয়জাত সমভূমি।

ক্ষয়জাত সমভূমি (Erosional plains) : বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির যেমন— নদীপ্রবাহ, বায়ুপ্রবাহ এবং হিমবাহের ক্ষয়ক্রিয়ার ফলে কোনো উচ্চভূমি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে ক্ষয়জাত সমভূমির সৃষ্টি হয়। অ্যাপালেশিয়ান পাদদেশীয় সমভূমি, ইউরোপের ফিনল্যান্ড ও সাইবেরিয়া সমভূমি এ ধরনের ক্ষয়জাত সমভূমি। বাংলাদেশের মধুপুরের চত্বর ও বরেন্দ্রভূমি দুটি ক্ষয়জাত সমভূমির উদাহরণ।

সঞ্চয়জাত সমভূমি (Depositional plains) : নদী, হিমবাহ, বায়ুপ্রবাহ প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তি দ্বারা পলি, বালুকণা, ধূলিকণা কোনো নিম্ন অঞ্চলে সঞ্চিত হয়ে কালক্রমে যে সমভূমি সৃষ্টি হয় তাকে সঞ্চয়জাত সমভূমি বলে। এ ধরনের সঞ্চয়জাত সমভূমি পার্বত্য অঞ্চল থেকে শুরু করে সমুদ্র উপকূল পর্যন্ত যে কোনো অবস্থানে সৃষ্টি হতে পারে। যেমন— নদীর পলি অবক্ষেপণের মাধ্যমে সৃষ্ট প্রাবন সমভূমি, নদীর মোহনার কাছাকাছি এসে নদী সঞ্চয়ের মাধ্যমে সৃষ্ট ব-দ্বীপ, শীতপ্রধান এলাকায় হিমবাহের গ্রাবরেখা দ্বারা সঞ্চয়কৃত পলি থেকে গড়ে ওঠা হিমবাহ সমভূমি।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। কোনটি থেকে গ্রাফাইট উৎপন্ন হয়?

(ক) চুনাপাথর

(খ) কয়লা

(গ) বেলোপাথর

(ঘ) গ্রানাইট

২। নিম্নগতিতে নদীর—

i. স্রোতের গতি বেড়ে যায়

ii. গভীরতা কমে যায়

iii. পার্শ্বক্ষয় হ্রাস পায়

নিচের কোনটি সঠিক?

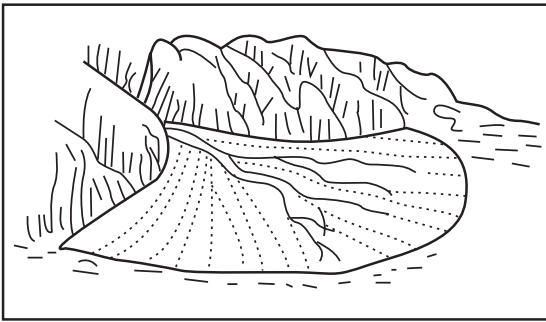
(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

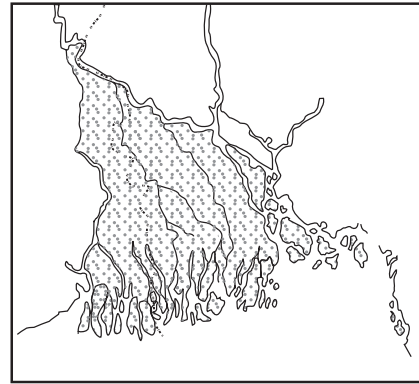
(গ) ii ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

চিত্র দুটি পর্যবেক্ষণ করে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :



চিত্র ১



চিত্র ২

৩। চিত্র ১-এর ভূমিরূপ বাংলাদেশের কোন অঞ্চলে দেখা যায়?

(ক) দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে

(খ) দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে

(গ) উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে

(ঘ) উত্তর-পূর্বাঞ্চলে

৪। চিত্র ১ ও চিত্র ২ উভয়ের ভূমি গঠিত হয়—

- i. পলি সঞ্চয়ের মাধ্যমে
- ii. নদীর মোহনায়
- iii. ক্ষয়কার্যের মাধ্যমে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। বিধান ও হিমেল কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে ইতালি গেলেন। একদিন বিকেলে তারা ঘুরতে গিয়ে দেখতে পান একটি স্থানের ভূমি খাড়া ঢালবিশিষ্ট এবং দেখতে অনেকটা মোচাকৃতির। কথা প্রসঙ্গে তারা জানতে পারেন বিধানের বাড়ি বাংলাদেশের বান্দরবানে এবং হিমেলের বাড়ি খুলনায়।

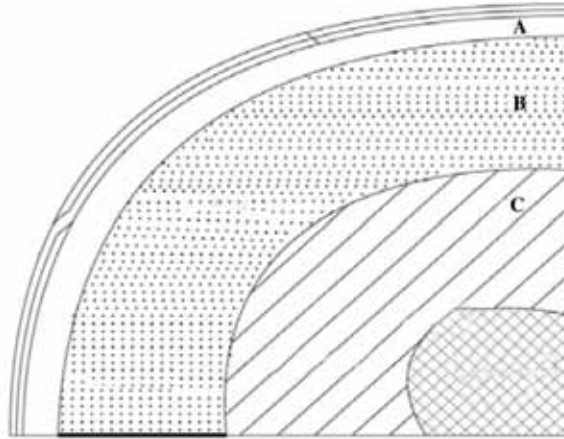
ক. নদী উপত্যকা কাকে বলে?

খ. উর্ধ্বগতিতে নদী উপত্যকা ‘ভি’ আকৃতির হয় কেন? ব্যাখ্যা কর।

গ. বিধান ও হিমেলের দেখা ভূমিরূপটির ভূপ্রাকৃতিক গঠন বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা কর।

ঘ. তাদের উভয়ের বাড়ি যে অঞ্চলে অবস্থিত সেই অঞ্চল দুটির ভূমির গঠন বৈশিষ্ট্যের তুলনামূলক বিশ্লেষণ কর।

২।



ক. খনিজ কী?

খ. পাললিক শিলায় জীবাশ্ম দেখা যায় কেন? ব্যাখ্যা কর।

গ. উপরের চিত্রে ‘A’ চিহ্নিত স্তরের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উপরের চিত্রে ‘B’ ও ‘C’ স্তরের গঠন বৈশিষ্ট্যের ভিন্নতা আছে কি? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও।